বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার
মুখপত্র

প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংকলন
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮

দাম : ৫০ পয়সা

- বিজ্ঞানের ইতিহাসের ভূমিকা—২
- The Scaffold Called 'National Science'—৯
- ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—১৩
- পুস্তক পরিচিতি—১৫
- সংবাদ—১৬

সম্পাদকীয়

প্রাকৃতিক আক্রমণের মুখে আমরা আরো একবার অত্যন্ত অসহায়ভাবে পর্যুদস্ত হলাম। সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংঘটিত হলো গত ১৭ই নভেম্বর অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর উপকূলবর্তী অঞ্চলে। আবহাওয়া অফিস থেকে ঘূর্ণিবাত্যার খবর ছিল, কিন্তু তার সাথে ছিল না সম্ভাব্য আক্রমণ রোধের জন্য কার্যকর কোনও প্রস্তুতির ব্যবস্থা। ফলে দীর্ঘদিন ধরে যা হয়ে আসছে তাই হলো—লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষকে চরম মূল্য দিয়ে প্রমাণ করে যেতে হলো তথাকথিত উন্নতির, তথাকথিত প্রগতির চূড়ান্ত অন্তঃসারশূন্যতা। এ ট্রাজেডির জন্য দায়ী কে? বরাবরের ঐতিহ্যমাফিক এবারও ঘটনার পরই শুরু হয়েছে পারস্পরিক দোষারোপ, কাদা ছোঁড়াছুড়ির পালা, বিপক্ষ দল বা গোষ্ঠীকে দোষী প্রমাণ করে সংকীর্ণ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ফায়দা তোলার কদর্য প্রচেষ্টা; কিন্তু সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত বা দলীয় স্বার্থের কথা বাদ দিলেও, দেশের সাধারণ মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই এবারও দেখা দিয়েছে প্রশ্ন—যে প্রশ্নের সঠিক উত্তরের ওপর নির্ভর করছে ভবিষ্যতে সমস্যার সমাধান। সমাজের প্রতিটি স্তরে চলুক অনুসন্ধান, চলুক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের আপোষহীন প্রচেষ্টা। সেই সাথে বিজ্ঞানকর্মীদের মনেও জাগুক তীব্র আত্মজিজ্ঞাসা —ভূগর্ভস্থ আণবিক বিস্ফোরণের আওয়াজে কি চাপা পড়বে লক্ষ লক্ষ মানুষের মরণ-আর্তনাদ? মারণাস্ত্র আর গ্রহান্তরে মানুষ পাঠানোর গবেষণা কি হওয়া উচিৎ আজকের দিনে বিজ্ঞানচর্চার অভিমুখ? বিজ্ঞানের অপব্যবহার বন্ধ করে দেশের মানুষের স্বার্থে বিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা তথা সংগ্রামের দায়িত্ব কি এখনও থাকবে উপেক্ষিত?

প্রসঙ্গান্তরে আসা যাক। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানের অধ্যাপকদের একতরফা ছাঁটাই প্রসঙ্গে গত সংখ্যায় আমরা আলোচনা করেছি। দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, কর্মচ্যুত শিক্ষকদের পুনর্বহালের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কোন মহল থেকেই কার্যকর কোন প্রচেষ্টা এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনও দেখিয়ে চলেছেন সমাহিত ঔদাসীন্য। আমরা এ পরিস্থিতির আশু নিরসনের জন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চার গুরুত্ব আজ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আর সমাজবিজ্ঞান উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকেই ক্রমশঃ বেশী করে স্বীকৃত হচ্ছে। এই কারণে আমরা এ সংখ্যায় 'বিজ্ঞানের ইতিহাসের ভূমিকা' শীর্ষক রচনাটা প্রকাশ করলাম। ভবিষ্যতে এ-প্রসঙ্গে আরও রচনা প্রকাশ করা হবে। বিজ্ঞানের ইতিহাসের ওপর গত কয়েক দশকে প্রচুর গবেষণা আর আলোচনা হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য একদিকে সেগুলোর সারসংকলনে সহায়তা করা, আর অন্যদিকে সেগুলোর ভিত্তিতে ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাস তার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সঠিকভাবে বোঝবার চেষ্টা করা। দ্বিতীয় কাজ এখনও অনেকাংশে অসমাপ্ত রয়েছে। আমরা অদূর ভবিষ্যতে এ কাজে অংশগ্রহণের আশা রাখি।

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' পত্রিকাকে প্রথম থেকেই দ্বিভাষিক করার প্রচেষ্টা ছিল। এ সংখ্যা থেকে এই পত্রিকা দ্বিভাষিক রূপে প্রকাশিত

হচ্ছে। ফলে অবাঙালী পাঠকদের প্রয়োজন কিছুটা মেটানো সম্ভব হবে। বাংলা প্রবন্ধগুলোর আগে ইংরাজিতে সারসংক্ষেপ দেওয়া থাকবে। একইভাবে থাকবে ইংরাজি প্রবন্ধের আগে বাংলা সারসংক্ষেপ। এ সংখ্যায় "দি স্ক্যাফোল্ড কল্ড 'ন্যাশনাল সায়েন্স" ('জাতীয় বিজ্ঞান' এর ফাঁসিকাঠ) প্রবন্ধে বিজ্ঞানী বিনোদ শাহের আত্মহত্যার প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশিত ইজ্জতনগরে পশুচিকিৎসা গবেষণা সংস্থার ঘটনাবলী প্রমাণ করছে যে বিজ্ঞান গবেষণা নিয়ে বিজ্ঞানের উপরওয়ালাদের দুর্নীতি এখনও চলছে পুরোদমে। এই দুর্নীতিরোধে বিজ্ঞানকর্মীদের সচেতন প্রয়াস সংগঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিনোদ শাহের আত্মোৎসর্গ ব্যর্থ হয়ে থাকবে।

বিজ্ঞানের ইতিহাসের ভূমিকা

[An introductory framework for the study of history of science is presented. Roots of origin of modern science have been traced. The principal characteristics of the scientific method have been discussed. The relation between science and technology has been indicated. The roles of social demand and individual contributions in the development of science have been analyzed. The inverse effect of science and technology on society, the roles of dogma and openness of mind in science, and the national and international aspects in science have been briefly discussed].

বিজ্ঞান ও আধুনিক সমাজ

আজকের জগতে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে এবং উন্নত দেশগুলিতে, বিজ্ঞান যে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রচণ্ড শক্তিরূপে কাজ ক'রছে এবং ভবিষ্যতে আরো করবে, এবিষয়ে কম-বেশী ধারণা প্রায় সকলেরই আছে। যত দিন যাচ্ছে বিজ্ঞানের প্রভাব তত বাড়ছে। "মানুষ আছে পৃথিবীতে প্রায় দশ লক্ষ বছর। হাজার ছয়েক বছর হল সে লিখন আয়ত্ব করেছে। কৃষিকাজ তার কিছু আগে, কিন্তু খুব আগে নয়। শিক্ষিত শ্রেণীর চিন্তা-ধারাকে বিজ্ঞান প্রভাবিত ক'রছে শ' তিনেক বছর ধ'রে। সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিপুলভাবে এগিয়ে নিয়েছে শ' দেড়েক বছর হল। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিজ্ঞান অবিশ্বাস্য বৈপ্লবিক শক্তিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে (বার্ট্রাণ্ড রাসেল)।" রোমান সাম্রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতির যুগেও মানুষের গড়পড়তা আয়ুষ্কাল ২৫ বছরের বেশী ছিল না। অগ্রসর ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলিতে এই আয়ুষ্কাল এখন প্রায় ৭০ বছর এবং তা সম্ভবতঃ আরো বাড়বে। আমেরিকার একজন সাধারণ নাগরিক যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করেন, প্রাচীন মিশরের ফ্যারাওরা তা কল্পনাও করতে পারতো না। আমাদের পাড়ার ডাক্তারটির রোগনিরাময় করার যা ক্ষমতা, জীবক, চরক, সুশ্রুত, হিপোক্রেটিস্, গ্যালেনের সমবেত ক্ষমতাও তার বেশী ছিল না। এক কথায়, বিজ্ঞান দিতে পারে ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, রোগযন্ত্রণার নিরাময়, রোদ ঝড় বৃষ্টি থেকে নিরাপদ আশ্রয়। অন্ধকারকে উজ্জ্বলতায় ভরে দিতে পারে, পারে মানুষকে একঘেয়ে একটানা খাটুনি থেকে মুক্তি দিতে। কল্পনার স্বর্গকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে বিজ্ঞান।

অসমান দুনিয়ায় শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যে শাসকশ্রেণী বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রিত করে তারা আবার এই শক্তিকেই ব্যবহার করতে পারে মানুষকে দাসত্বের বন্ধনে বেঁধে রাখতে, পারে কল্পনার নরককে বাস্তবায়িত করতে। যা করা হয়েছে হিরোসিমা নাগাসাকিতে অথবা ভিয়েতনামে। অনিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞান, অপব্যবহৃত বিজ্ঞান, পরিবেশকে দূষিত করতে পারে; এবং মানুষের সমাজকে ও পারিবারিক জীবনকে অশান্তিময় করে তুলতে পারে।

আশঙ্কা আর সম্ভাবনায় ভরপুর এই বিরাট শক্তি একদিনে কোন বিশেষ দেশে আবির্ভূত হয়নি। শতশত বছর ধরে দেশে দেশে অসংখ্য কর্মীর নিরলস সাধনার উত্তরাধিকারী বর্তমান মানব সমাজ। বিজ্ঞানের ইতিহাস মানব সভ্যতার দেহ ও আত্মার বিবর্তনের ইতিহাস। ঠিকমতো দেখতে পারলে এর ভিতর পাওয়া যাবে মানুষের দার্শনিক চিন্তার বিকাশের বিচিত্র কাহিনী, আর মানব গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিবর্তনের বিচিত্র ইতিহাস। দেশে দেশে যুগে যুগে বিবর্তিত বিজ্ঞানের এই চমকপ্রদ ও বিচিত্র ইতিহাস না জানলে বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ ভাবে জানা যাবে না; যে নতুন আদর্শ এ যুগের মানুষের কাছে বিজ্ঞান তুলে ধরছে তার তাৎপর্য পরিষ্কার হবে না। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ রূপায়ণের যাত্রাপথে এই বিষয়টি সহায়ক হবে যথেষ্ট, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, যেখানে বিজ্ঞান কর্মীদের চিন্তাধারার মধ্যেও বিস্তর রহস্যময়তা, অজ্ঞেয়তাবাদ, অবৈজ্ঞানিক মধ্যযুগীয় মানসিকতা এখনও বিদ্যমান। ইতিহাস আলোচনার উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে ই, এইচ, কার-এর একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে: "ঐতিহাসিকের কাজ

অতীতকে ভালবাসা নয়, অতীত থেকে নিজেকে মুক্ত করাও নয়। অতীতকে জানতে হবে বুঝতে হবে, যাতে বর্তমানকে আরো উপলব্ধি করা যায়। বর্তমানের সমস্যাবলীর আলোতে ঐতিহাসিকের চোখে অতীত যখন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তখনই কেবল মহান ইতিহাস সৃষ্টি হয়। .....অতীতের ধারণা দিয়ে যেমন বর্তমানকে বুঝতে হয়, তেমনি বর্তমান দিয়েও অতীতকে বুঝতে হয়।" (—ই, এইচ, কার, ১৯৬২)।

কবে থেকে বিজ্ঞান এলো?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে প্রথমেই ঠিক করে নিতে হবে বিজ্ঞান আমরা কাকে ব'লব? বিজ্ঞান বলতে যদি শুধু যন্ত্রকৌশল, উৎপাদন পদ্ধতির জ্ঞান বা প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা বুঝি তা হলে বলতেই হবে, মানুষ যত প্রাচীন বিজ্ঞানও তত প্রাচীন। যতদূর জানা যায়—সুপ্রাচীন কালে মিশর, সুমেরিয়া, ব্যাবিলন, মহেঞ্জোদাড়ো প্রভৃতি স্থানে সুদীর্ঘ পর্যবেক্ষণ, মননশীলতা এবং বহুজনের দীর্ঘ কর্মকাণ্ডের অভিজ্ঞতা থেকে পশুপালন, কৃষিকার্য, সেচব্যবস্থা, নগরনির্মাণ, নৌচালনা, সোনা, তামা, পিতল প্রভৃতির ব্যবহারিক জ্ঞান, চীনামাটি, নানাবিধ রাসায়নিকের ব্যবহার, ভেষজ দ্রব্যের গুণাগুণ, লিখন, গণিত, প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তর জ্ঞান অর্জিত হয়েছিলো। সুমেরীয়রা হিসাব রাখবার জন্য লিখবার পদ্ধতি ও নানা প্রকার ওজনের পরিমাপ উদ্ভাবন করেছিল। বৎসরকে বারো মাসে ভাগ করা, সপ্তাহের সাতদিনের বিশেষ নামগুলি, প্রতিদিনের মধ্যে দিনের আলোর বারো ঘণ্টা ও রাত্রির বারো ঘণ্টা নির্দেশ—এই সব ব্যাবিলনের সৃষ্টি। নক্ষত্র ও গ্রহদের মধ্যে পার্থক্য, তাদের নামকরণ ও গতি নির্দেশ ইত্যাদি অবলম্বনে জ্যোতির্বিদ্যার আরম্ভ সেখানে। ব্যাবিলনীয় পুরোহিতদের এই সব বিদ্যা পরে গ্রীকরা অধিগত করে। কিন্তু আমরা এইগুলিকে উপকারী জ্ঞান ও কলাকৌশল বলতে চাই। আবার মানুষের সাধারণ উত্তরাধিকার হিসাবে বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনায় অবশ্যই এগুলিকে রাখতে চাই। জ্ঞান বিজ্ঞান ও কার্যকরী কলাকৌশলের আবিষ্কারের বেগ ভীষণ দ্রুততর হয় রেনেশাঁ-উত্তর ইউরোপে—বিশেষ করে গ্যালিলিওর পর থেকে। তত্ত্ব ও প্রয়োগের অভূতপূর্ব এক মিলনে ইউরোপে আসে শিল্পবিপ্লব ও আধুনিক বিজ্ঞান-বিপ্লব। এই বিদ্যায় বলীয়ান পাশ্চাত্য দেশগুলি আজো পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার ক'রে আছে।

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

Scientia কথাটি চতুর্দশ শতাব্দিতে চসার কলা ও বিজ্ঞান সব রকম জ্ঞানের জন্যই ব্যবহার করেছিলেন। এই ল্যাটিন শব্দটির অর্থ হল জানা, to know। যে অর্থে Science কথাটি বর্তমানে ব্যবহৃত হয় তা উনবিংশ শতকের প্রথম থেকে শুরু। মধ্যযুগে বিজ্ঞানকে বলা হ'ত Natural Philosophy. (গ্রীক ভাষায় Philosophia মানে ছিল 'জ্ঞান প্রেম')। রোজার বেকনকে (১২১৪-৯২ খৃঃ) বিজ্ঞানের মুক্তি-দাতা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। কারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনিই প্রথম স্পষ্ট পথনির্দেশ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে সমগ্র জ্ঞানের মধ্যে শুধু এক অভেদ্য একতার সন্ধান করে লাভ নেই; এই ভাবে অযথা হয়রানির পরিবর্তে বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্বজ্ঞদের উচিত প্রথমে "পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা জ্ঞানের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করা, জ্ঞানের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা। তথ্যের সহিত সম্যক্‌রূপে পরিচিত হইবার সুযোগ না ঘটিলে এবং যথোপযুক্ত পর্যবেক্ষণের দ্বারা এই তথ্যের অভ্রান্ততা নির্ণয় করিতে না পারিলে জ্ঞানের সত্যকার মূল্য নিরুপণ যে সম্ভবপর নয় ইহা বেকন সুস্পষ্টরূপে প্রথম অনুধাবন করেন। তিনি আরো অনুভব করেন যে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভ্রান্ততা নির্ণয়ই যথেষ্ট নহে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন গণিতের প্রয়োগ। গণিতের প্রয়োগ ব্যতিরেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি একরূপ অসম্ভব। এই মহাসত্য উপলব্ধি হইতেই আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম।.....বেকন বিজ্ঞানকে শুধু জ্ঞান ও দর্শনের এক বিশেষ শাখা হিসাবে দেখেন নাই। মানুষের প্রয়োজনের দিক হইতেও তিনি বিজ্ঞানকে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। .....ইহাও এক অভিনব দৃষ্টি। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সিস বেকন সুসংবদ্ধভাবে জোরালো ভাষায় বিজ্ঞানের এই প্রয়োজনীয়তাবাদেরই জয়গান করিয়াছিলেন।.....এইভাবে বিচার করিবার ফলে বিজ্ঞান, শুধু বিজ্ঞান কেন, সমগ্র দর্শন ও শিক্ষাব্যবস্থা তাঁহার দৃষ্টিতে এক নূতন তাৎপর্য লাভ করিয়াছিল" (সমরেন্দ্র নাথ সেন)। বিজ্ঞানের এই পদ্ধতি (যা গ্যালিলিওতে আরো পূর্ণতর ভাবে বিকশিত হয়) ও দৃষ্টিভঙ্গী মননশীলতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমশঃ ব্যাপক ভাবে প্রসার লাভ ক'রেছে এবং আজকের দিনে ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইত্যাদিতে ক্রম-বর্ধমান ভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে। এই হল বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের দার্শনিক-দৃষ্টিভঙ্গী। হালডেন ঠিকই বলেছেন—"বিজ্ঞান একটি দৃষ্টিভঙ্গী, কতক-গুলি তথ্য বা ঘটনার সমষ্টি নয়।"

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পারস্পরিক সম্পর্ক

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, Science and technlogy, অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত হোলেও দুই কিন্তু এক নয়। দুইয়ের গতির ও বিকাশের ধারায় কিছু কিছু স্বতন্ত্র নিয়মের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞান জগতের গতি ও প্রকৃতির সূত্র বার করে; ফলে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে মানুষের ধারণার পরিবর্তন হয়। বিজ্ঞান তাই দর্শন ও সংস্কৃতিকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বদলালে সমাজ পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয় (যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্স)। কোপার-নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটনের জ্যোতির্বিদ্যা ও বলবিদ্যার আবিষ্কার বা

ভেসালিয়াস, হার্ভের কাজকর্ম ইউরোপের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। ডারউইনের তত্ত্ব মানুষের চিন্তাধারাকে ব্যাপকভাবে পাল্টে সমাজতন্ত্রের আদর্শ আরো ঈপ্সিত ও সহজলভ্য করে তোলে।

প্রযুক্তিবিদ্যা কিন্তু মানুষের ধ্যানধারণার চাইতে অর্থনীতির সাথেই বেশী যুক্ত। তার অগ্রগতির ফলে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়ে, সামাজিক শ্রেণীগুলির পুনর্বিন্যাস হয়, এবং কালক্রমে উৎপাদনসম্পর্ক পরিবর্তিত হয়ে নূতন সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। উৎপাদনের উন্নয়নে প্রযুক্তিবিদ্যার কাজকর্ম থেকেও কিছু বিজ্ঞান উদ্ভূত হোতে পারে। এছাড়া, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সমাজের নিয়ন্ত্রণকারী শ্রেণীগুলো সাধারণতঃ কারিগরী আর প্রযুক্তিবিদ্যার রাশ টেনে রাখার চেষ্টা করে বেশী। বিজ্ঞানের ওপর সাধারণত তাদের প্রভাব থাকে পরোক্ষ। আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দ্বারা প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং ইচ্ছামত বা প্রয়োজন মত নতুন দ্রব্যাদি উৎপাদন সাম্প্রতিক ঘটনা। প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের গতি এতদিন সমান্তরাল হোলেও অতি সম্প্রতি তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া বিক্রিয়া (interaction) বাড়ছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তাকে উৎপাদনে প্রয়োগের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বোধহয় ক্রমশঃ কমে আসছে। আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ফটোগ্রাফীতে প্রয়োগ হতে সময় লেগেছে প্রায় একশ বছর, টেলিফোনে পঞ্চাশ বছর, রাডারে পনেরো বছর, পরমাণু বোমায় ছয় বছর, মেসারে (MASER) প্রায় দুবছর। তবে এই ক্রিয়াবিক্রিয়া ব্যাপারটি এখনও খুব পরিষ্কার নয়। ভিন্নমতের নমুনাস্বরূপ একটি বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। টেকনলজির ঐতিহাসিক Derek J. de S. Price বলেন—

"অর্থনীতিবিদরা কেউ কেউ বলছেন যে সময়ের এই ব্যবধান ক্রমশ কমে আসছে। টেকনলজির ঐতিহাসিক হিসাবে একথা আমি মানতে পারছি না। পেনিসিলিন এবং ট্রানজিসটারের মত চমকপ্রদ ঘটনাগুলির, যা মোটেই সাধারণ ধারার প্রতিনিধিত্ব করে না, তার দিকে তাকিয়ে এটাই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার স্বাভাবিক পরিবর্তনের ধারা মনে করলে ভুল করা হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষীণ ক্রিয়া বিক্রিয়ায় উভয়ের মধ্যে যে বেশ কিছু ব্যবধান আছে সেই বিষয়ে আমরা সাধারণভাবে একমত হতে পারি। এবং যেরকম দ্রুতগতিতে শক্তিশালী ক্রিয়া বিক্রিয়ায় পুরাতন প্রযুক্তিবিদ্যা থেকে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা এবং পুরাতন বিজ্ঞান থেকে নতুন বিজ্ঞান সৃষ্টি হয়, এটা তার বিপরীত।" ঐতিহাসিক টয়েনবির মতে বিজ্ঞান এবং কারিগরীর প্রকৃতি একই রকম, গতি সমান্তরাল। একই আসরে একই সঙ্গীতে তারা যেন যুগ্ম নর্তক, কে এগিয়ে কে পেছিয়ে তা সঠিক বলা যায় না। এই সঙ্গীতটি কি? ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মতে এই সঙ্গীত হল সমাজের চাহিদা, যা নির্দ্ধারণ করে কোন সময়ে কোন ধরনের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবন হবে।

সামাজিক চাহিদা বনাম ব্যক্তিগত উদ্যোগ—বিপরীত দুই মতের সমন্বয়ঃ ১, ৪, ৫

প্রকৃতিকে বশ করে তার নিয়মাবলীকে মানুষের কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা থেকেই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভব। আয়নীয় ও এপিকিউরীয় দার্শনিকেরা প্রথমে এই সত্য উপলব্ধি করেন। রোজার বেকনের দর্শনের মূলমন্ত্রে উপযোগিতা ও প্রগতি দুই একসূত্রে বাঁধা। মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ও তার দুঃখ দুর্দশার লাঘব ঘটানোই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। তাই সামাজিক চাহিদাই যে বিজ্ঞানের প্রধান চালিকাশক্তিরূপে কাজ করবে তা স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের উক্তিটি স্মরণীয়: "এতদিন বড়াই করে বলা হয়েছে উৎপাদন (ব্যবস্থার উন্নতি) বিজ্ঞানের কাছে কত ঋণে ঋণী, কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার কাছে (স্বীয় উন্নতির জন্য) বিজ্ঞান অসীম পরিমাণ বেশী ঋণী।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরো লিখেছেন:

"প্রথমে জ্যোতির্বিদ্যার কথা ধরা যাক। এটা পশুপালক ও কৃষিজীবী সমাজের (কালগণনা ও) ঋতু বোঝবার জন্য অপরিহার্য। গণিত ছাড়া জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি হতে পারে না, সুতরাং গণিতের উন্নতি করতে হ'ল। তারপর কৃষির উন্নতির একটি স্তরে কোনো কোনো জায়গায় চাষের কাজে জল তোলবার জন্য (যেমন মিশর) এবং শহরের আবির্ভাবের সাথে সাথে বড় বড় ইমারত তৈরীর প্রয়োজনে এবং নানা কারিগরী কাজের জন্য বলবিদ্যার (mechanics) প্রচলন হ'ল। অতঃপর একে নৌচালনা ও যুদ্ধের কাজে প্রয়োগ করা হল। এর জন্য প্রয়োজন হ'ল আরো গণিতের। সুতরাং তার আরো উন্নতি হল। সুতরাং বিজ্ঞানের আবির্ভাব ও বিকাশের মুহূর্ত থেকেই উৎপাদন বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে।

"তাই প্রাচীনকাল থেকে যথাযথ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান (জ্ঞানের) এই তিনটি শাখাতেই থাকলো সীমাবদ্ধ, এবং বস্তুঃপক্ষে সঠিক সুসংবদ্ধ গবেষণা ক্লাসিকাল যুগের পর (হ'ল এখানেই) (যথা আলেজান্দ্রিয়ায় আর্কিমিদিস প্রভৃতিদের দ্বারা)। মৌলিক পদার্থের তত্ত্ব তখন কেবল এসেছে। কিন্তু রাসায়নিক মৌলের ধারণা না আসায় পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যা মানব মনে তখনও আলাদা হয় নি। উদ্ভিদ ও প্রাণীবিদ্যা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের অ্যানাটমি সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগৃহীত হওয়া এবং সুসংবদ্ধভাবে গ্রথিত হওয়ার বেশী কিছু হতে পারে নি। পরিপাক বা মলনিঃসারণ প্রভৃতির মত অপ্রত্যক্ষ বিষয়গুলি যখনই এসেছে তখনই শরীরবিদ্যা (physiology) আন্দাজের চাইতে বেশী কিছু হোতে পারে নি। রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া যখন ছিল অজ্ঞাত তখন এর বেশী হওয়া সম্ভবও ছিলনা। এই যুগের পর অত্যন্ত আদিমভাবে কিমিয়াবিদ্যা বা অ্যালকেমিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করলো কেমিষ্ট্রী।

মধ্যযুগের কালো রাত্রির পর কল্পনাতীত শক্তি নিয়ে নতুন ভাবে বিজ্ঞানের উদয় হ'ল। যাদুগতিতে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হ'ল। এর মূলে আবার দেখা যায় সেই উৎপাদন। প্রথম ধর্মযুদ্ধের (crusades)

পর শিল্পের হল দ্রুত বিকাশ; এল নানান নূতন যান্ত্রিক (বয়ন, ঘড়ি নির্মাণ, যাঁতাকল), রাসায়নিক (রঞ্জক, ধাতুবিদ্যা, এ্যালকোহল) এবং ভৌতিক (লেন্স ও চশমা) উন্নতি। এর ভিতর দিয়ে পর্যবেক্ষণের জন্য এলো বহুতর পদার্থ। আরো এলো (আগে ছিল না) পরীক্ষা করবার অনেক বিষয়, এবং নতুন যন্ত্রপাতি। সুসংবদ্ধ পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান এই প্রথম সম্ভব হল এটা বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ একটি প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী হিসাবে ইতালি সকলের শীর্ষে থাকলেও পোল্যাণ্ড সমেত মধ্য এবং পশ্চিম ইউরোপ এইবার সুসংবদ্ধ ভাবে একযোগে বিকশিত হোতে থাকলো। তৃতীয়তঃ, লাভের জন্য, অর্থাৎ চরম বিচারে উৎপাদনের জন্য, নানা ভৌগলিক আবিষ্কারের ফলে জলবায়ু প্রাণী উদ্ভিদ এবং (মানব) শারীরবিদ্যা সম্বন্ধীয়-এর আগে পর্যন্ত না জানা অসীম জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার খুলে গেল। চতুর্থতঃ এল মুদ্রণ ও ছাপাখানা।

এর পর আগে বিকশিত গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও বলবিদ্যা ছাড়া পদার্থবিদ্যাকে রসায়ন থেকে আলাদা ভাবে দেখা গেল (টরিসেলি, গ্যালিলিওর আবির্ভাব)। শিল্পনগরাদিতে জলসরবরাহের জন্য টরিসেলি জলের গতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলেন। রবার্ট বয়েল রসায়নকে বিজ্ঞান হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রলেন, হার্ভে মানুষ ও প্রাণীর Psysiology-র জন্যে অনুরূপ কাজ ক'রলেন রক্তসঞ্চালন আবিষ্কার করে। প্যালিও-ন্টোলজি আসরে আসবার আগে পর্যন্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীবিদ্যা বলতে কেবল সংগ্রহ বিদ্যাই বোঝাতো। কুভিয়ের ও তার কিছু পরে আবিষ্কার হ'ল কোষ (cell) এবং তারপরেই আসল জৈব রসায়ন। সেই সাথে সম্ভব হ'ল মরফোলজি ও ফিজিওলজি। এবং তারপর থেকে উভয়ে সত্যিকারের বিজ্ঞানপদবাচ্য হ'ল। ভূবিদ্যা বিগত (অষ্টাদশ) শতকের শেষ দিকে শুরু হ'ল। এবং শুরু হলো সাম্প্রতিককালে (বিশ্রীভাবে নামাঙ্কিত) 'এ্যানথ্রো-পোলজি' (Anthropology), যার সাহায্যে মানুষ এবং মানব সমাজের মরফোলজি এবং ফিজিওলজি থেকে ইতিহাসে উত্তরণ হ'ল সম্ভব।"

কিন্তু সমাজের প্রয়োজন থেকে বিজ্ঞানের উদ্ভব, এই কথা আর এক দল বিজ্ঞানী মানতে চান না। তাঁদের ধারণা আপন নিয়মে বিজ্ঞান এগিয়ে চলে, ব্যক্তিগত উদ্যম ও কৌতূহল এর প্রধান প্রেরণা। তাঁদের মতে শিল্পের জন্যই যেমন শিল্প হতে পারে, তেমনি বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান সঠিক এবং সম্ভব; বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্কার যদি মানুষের কোনো উপকার বা অপকারে লাগে তবে তা নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই মতের সমর্থক ছিল বেশী। বর্তমানকালে এডিংটন, হোয়াইট-হেড প্রমুখ বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা বিজ্ঞানকে বিশুদ্ধ মননশীলতার পর্যায়ে ফেলে সমাজের সঙ্গে এর সম্পর্ককে পুরোপুরি অস্বীকার না করলেও অবান্তর মনে করেন। তাঁদের মতে সমাজের সঙ্গে ঠিক বিজ্ঞানের নয়, ফলিত বিজ্ঞানের সম্পর্ক আছে, এবং ফলিত বিজ্ঞান বা Technology প্রকৃত বিজ্ঞানপদবাচ্য নয়।

অনেকে, বিশেষ করে মার্কসবাদীরা, এই মত গ্রহণ করতে একেবারেই প্রস্তুত নন। J. D. Bernal এর মতে ব্রহ্মাণ্ড, জন্ম মৃত্যু, সৃষ্টিরহস্য প্রভৃতি দুর্জ্ঞেয় বিষয়ের গবেষণা যদি বিজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য হ'ত তবে বিজ্ঞান বলতে আজ আমরা যা বুঝি, জানি, তা কোনো দিনই আসতে পারতো না (এঙ্গেলস এর পূর্বোক্ত বক্তব্য স্মরণীয়)। বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে সামান্য নজর দিলেই দেখা যাবে যে নিতান্ত পার্থিব যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দ্বারা ও মানুষের পার্থিব প্রয়োজনের প্রেরণায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ সম্ভব হ'য়েছে। বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে—"শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্র যে ভাবে (যুগে যুগে) স্থান থেকে স্থানান্তরে সরে সরে গেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রও সেই ভাবেই তাকে অনুসরণ করেছে। উল্টোটি কখনই হয়নি। ব্যাবিলন মিশর ও ভারত ছিল প্রাচীন বিজ্ঞানের কেন্দ্র; গ্রীস হল তাদের সাধারণ উত্তরাধিকারী। প্রাচীন নগর রাষ্ট্রগুলির পতনের আগেই মানুষের চিন্তাধারার সেই অগ্রগতি থেমে গেল। রোমে বিজ্ঞানের স্থান কমই ছিল, আর পশ্চিম ইউরোপের বর্বর রাষ্ট্রগুলিতে একেবারেই ছিল না। গ্রীসের উত্তরাধিকার যেখান থেকে এসেছিল সেই প্রাচ্য দেশেই আবার ফিরে গেল। সিরিয়া, পারস্য ভারতবর্ষ, এমনকি দূরের চীন দেশেও নতুন বিজ্ঞানের হাওয়া বইলো। এবং সবগুলি (মধ্যযুগে) ইসলামের পতাকাতলে চমৎকারভাবে সমন্বিত হ'ল। এখান থেকেই মধ্যযুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ইউরোপে প্রবেশ ক'রলো। এখানে বিজ্ঞান পরিপুষ্টি লাভ ক'রলো প্রথমে যদিও ধীরে, কিন্তু পরে সৃজনশীল কাজের এত বিপুল প্রসার ঘটল যার ফলে জন্ম নিল আধুনিক বিজ্ঞান।"

বার্ণাল আরো এগিয়ে গিয়ে বলেছেন—"প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার কাজকর্মে যে পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন শুধু তাই নয়, যে আইডিয়াগুলি তাঁদের তাত্ত্বিক কাজকর্মকে চালিত করে, সেগুলিও সামাজিক গতি ও ঘটনাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।" অনেকে এই ধরণের বক্তব্যকে অস্বীকার করেছেন, অনেকে আবার ততোধিক জোরের সাথে একে সমর্থন করেছেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপরোক্ত দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই কিছু কিছু সত্য থাকলেও আমাদের মতে সামগ্রিক বিচারে সামাজিক চাহিদাই বিজ্ঞানের মূল চালিকাশক্তি। এঙ্গেলস এর বক্তব্য বোধহয় সত্যের খুবই কাছে থাকে যখন তিনি বলেন—"সমাজের যদি কোনো কারিগরী চাহিদা থাকে তবে তা দশটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বিজ্ঞানকে বেশী এগিয়ে নিয়ে যায়।" তাঁর অন্যান্য অনেক বক্তব্য থেকে এটা মনে করা যেতে পারে যে এঙ্গেলস ব্যক্তিগত উদ্যম ও অনুসন্ধিৎসার ভূমিকাও অস্বীকার করেন নি। একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়েই এই প্রসঙ্গ শেষ করা যাক—

"... Internalist historians, ... stress intellectual factors in scientific growth and form a valuable

corrective to sociological macrotheorising. Internalist accounts are not, however, incompatible with sociological explanations as such .... external causes do not generate new activities ab initio"

(Barry Barnes, 1972).

বিজ্ঞানের আভ্যন্তরীণ গতি ও ব্যক্তি প্রতিভা :[৫,৮]

বিজ্ঞান ব'লতে বর্তমান যুগে যা বোঝায় তা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রধানতঃ ইউরোপেই আবির্ভূত হ'য়েছে। কেন এমন হ'ল? পৃথিবীর অন্য কোন সভ্যতায় বা মানব সংস্কৃতির অন্য কোন অঞ্চলে জ্ঞান বিজ্ঞানের এত দ্রুত বিকাশ ঘটল না কেন? চীন দেশও তো ঐ সময় অনেক এগিয়েছিলো; সেখানে কেন বিজ্ঞানবিপ্লব হ'লো না? জোনেফ নীড্‌হাম্ এই সব প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। বাইরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলি মানলেও ইউরোপে বিজ্ঞানবিপ্লবের সঠিক কারণ এখনও বিতর্কাতীত নয়। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) এবং তার আগে বিরাট মনীষা ও অপূর্ব কারিগরী প্রতিভা নিয়ে বিস্তর বিজ্ঞানীরা যা করতে পারেননি, গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) তা পেরেছেন। তিনি বিজ্ঞানের জয়যাত্রার বন্ধ দ্বার খুলে দিয়েছেন :

"The birth of the experimental-mathematical method which appeared in almost perfect form in Galileo and which led to all the development of modern science and technology presents history of science with one of its most important and complex questions ... the new or experimental philosophy was characterised by the search for measurable elements in phenomena and the application of mathematical methods to these quantitative regularities has long been recognised. A world of quantity was substituted for the world of quality but the advance into abstraction went further than these, for motion was considered apart from any particular moving bodies .... the instinctive experimentation of the technologist and craftsman differed from the conscious experimental test of precise hypotheses which formed the essence of the Galilean method."

গ্যালিলিওর পর নিউটন আর তাঁর সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের পূর্বসূরীদের পথ অনুসরণ ক'রে আর সেই পূর্বসূরীদের প্রবর্তিত ধারণাগুলির প্রভূত উন্নতি ঘটিয়ে পরবর্তী পর্যায়ের বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক তথা সামাজিক অগ্রগতির ভিত্তি দৃঢ় ক'রলেন। এ কাজে গ্যালিলিও, নিউটন আর তখনকার অন্যান্য বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিপ্রতিভার ভূমিকা কিছুমাত্র খাটো না ক'রেও বলা যায় যে সে সময়কার বিজ্ঞানের জোয়ারের পেছনে চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ ক'রেছিল সমাজের নিয়ন্ত্রক অবস্থানে এমন এক শ্রেণীর আবির্ভাব যে শ্রেণীর উন্নতি সরাসরিভাবে নির্ভরশীল ছিল উৎপাদনের অগ্রগতির ওপর। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতি তথা রাজনীতিতে যে পুঁজিবাদী শ্রেণীর প্রাধান্য বেড়ে চ'লেছিল, পূর্ববর্তী সামন্ত বা ব্যবসায়ী শাসকদের বিপরীতে তাদের ক্ষমতার মূল পূর্বসর্ত ছিল উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতি ঘটানো। সেই পর্যায়ে এই শ্রেণীর চাহিদাই সামাজিক চাহিদা হিসাবে বিজ্ঞানের চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ ক'রেছিল। এই চাহিদার ফলেই বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিপ্রতিভা সামাজিক তাৎপর্য লাভ ক'রতে পেরেছিল। এরই ফলে পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচ্য মনীষার (পর্যবেক্ষণ, গণিত ও যুক্তিবিদ্যা) পুনরুত্থানের সাথে যুক্ত হ'ল কারিগরী কাজকর্ম এবং তা ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে মূর্ত হ'লেও এই পদ্ধতি বিজ্ঞানের অগ্রগতির রুদ্ধ দুয়ার খুলে রেনেশাঁকে নিয়ে গেল এগিয়ে, সূচনা করল শিল্পবিপ্লব ও বিজ্ঞানবিপ্লব। চীনদেশ মুদ্রাযন্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ, কম্পাস, জাহাজ তৈরী, বারুদ, কাগজ প্রভৃতি বহু বিষয়ে এগিয়ে থাকলেও সেখানে যুক্তি ও গণিতের সাথে কারিগরী দক্ষতার সমন্বয় হয়নি। তাই চীন দেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতির বেগ ত্বরান্বিত হ'তে পারে নি ঐ সময়। আর সম্ভবতঃ অনুরূপ কারণে— বিশেষ করে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত নিম্নবর্ণের হস্তশিল্পীদের সাথে ভারতের শিক্ষিত ব্যবহারিক জ্ঞান ও কর্মদক্ষতাশূন্য অলস তার্কিক ব্রাহ্মণদের সুদৃঢ় ব্যবধান রচিত হওয়ায় ভারতের গৌরবময় প্রাচীন বিজ্ঞান-স্রোতস্বিণীর খরধারা মরুবুকে হারিয়ে যায় (সম্ভবতঃ নবম শতকে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের পর, এবং শঙ্করাচার্যের দার্শনিক নেতৃত্বে তথাকথিত হিন্দুধর্মের উত্থান ও জাতিভেদ প্রথা কঠিন হবার পর), নেমে আসে কুসংস্কারের ঘন তমস, যা আজও বহুল পরিমাণে র'য়ে গেছে।

সমাজের উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নব আবিষ্কারের প্রভাব :—[৩,৫,৬,৯]

কারিগরী কৌশল এবং সাধারণ কারিগররা বিজ্ঞানকে নানাভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কারিগরদের বিদ্যা অতীতেও যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল আজো তা আছে। কাঁচ ঘষে লেন্স আবিষ্কার এবং তা দিয়ে দূরবীক্ষণ তৈরী হওয়ায় কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, কেপলার টাইকো ব্রাহের জ্যোতির্বিদ্যার কাজকর্ম সম্ভব হয়েছিল। একই রকমভাবে, অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার না হ'লে পাস্তুরের পক্ষে জীবাণুবিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হ'ত না। কারিগরী কৌশলের আবিষ্কার বহু সময়ে সামাজিক এমন কি ধর্ম আন্দোলনের জন্ম দেয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে বহু ধর্মপ্রচারক এক বিরাট ভক্তি আন্দোলন ক'রেছিলেন (শ্রীচৈতন্য, কবীর, নানক, রামানন্দ প্রভৃতি)। জাতিভেদের বিরুদ্ধে এবং শাসকদলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলবার প্রচেষ্টা থেকে মারাঠা ও শিখদের অভ্যুদয়। বহু ঐতিহাসিক মনে করেন সেই যুগে শহরাঞ্চলের হস্তশিল্পী ও কারিগরদের জাগতিক প্রয়োজনেই, অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের সংগঠিত ক'রবার উদ্দেশ্যেই এই সব ধর্ম প্রচারকরা সমাজসংগঠকরূপে আবির্ভূত হন। চতুর্দশ শতক নাগাদ ভারতে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারিগরী কৌশল আসে যার ফলে ভারতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে।[১০] যেমন, বয়ন শিল্পের বিকাশ (উন্নত তাঁত ও সুতো কাটার উন্নত কৌশল), কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি (পারসিক চাকীর সাহায্যে সেচের উন্নতি), বাণিজ্যের বিকাশ (নৌ-চালনার জন্য কম্পাস), জ্ঞানের বিস্তার (কাগজ ; সবচেয়ে পুরাতন-কাগজের পাণ্ডুলিপি ১২৮২ খৃঃ), সময় মাপার পদ্ধতি (সূর্য-ঘড়ি)। চৈতন্যদেব নদীয়ার শাসনকর্তার ভয়ে জীবনের বেশীর ভাগ সময় বাংলার বাইরে কাটাতে বাধ্য হন ; শেষ পরিণতি তাঁর অজ্ঞাত। কবীর (কাশী এলাহাবাদ অঞ্চলে) নিহত হয়েছিলেন বলে সন্দেহ। একইরূপে, বিজ্ঞান ধনতন্ত্র এনেছে ; আর তার ফলে শ্রমিকশ্রেণী নূতন সমাজ ব্যবস্থার অগ্রদূতরূপে আবির্ভূত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নীল চাষকে কেন্দ্র করে বাংলা দেশে কি ভীষণ সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন হয় ; কিন্তু তাতে যা কাজ হয়নি, সুদূর জার্মানীতে হৈর্ব রাসায়নবিদ ফন বেয়ারের নীল সংশ্লেষণের সাফল্যে তা হয়েছে। বিজ্ঞান যখনই সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি স্বরূপ প্রচলিত দর্শনের বিরুদ্ধ কোন দর্শনের জন্ম দিয়েছে তখনই শাসক শ্রেণীর দুশ্চিন্তা শুরু হ'য়েছে। তাদের চোখের ঘুম নষ্ট হয়ে গেছে। তখন বিজ্ঞানের স্বাধীনতা, এমনকি বিজ্ঞানীদের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হ'য়েছে। দৃষ্টান্ত, গ্যালিলিও, জিওর্দানো ব্রুনো। তারও আগে রোজার বেকন, আরব দেশে অ্যাভেরোজ। আজকের মানুষের চোখে তাঁরা অত্যন্ত সাধারণ ও নির্দোষ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন—সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে না, পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে এবং এই ঘোরার জন্য কোনো বাড়তি বহিঃশক্তির প্রয়োজন নেই (inertia সূত্র)। আগের কালের ধারণা ছিল একটি বস্তুকে নড়াতে গেলে নিয়ত শক্তি প্রয়োগের ও সচেতন ইচ্ছার প্রয়োজন হয়। জগত সম্বন্ধে আবছা ধারণা নিয়ে সেটা ভাবা খুবই স্বাভাবিক। তাই চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রের নিয়মিত চলাচল দেখে তার পিছনে ঐশ্বরিক বা অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্ব ধরে নিয়ে বহু দিনের বহু যত্নের ফলে গড়ে তোলা দার্শনিক কাঠামোর ভিত্তিতে যে সমাজ ব্যবস্থা চালানো হচ্ছিল, নতুন বিজ্ঞানচিন্তা সেই চার্চ, পাদরী, সামন্তশ্রেণী, রাজার শাসনের দার্শনিক ভিত্তির মূলেই যে কুঠারাঘাত করবে, এটা বুদ্ধিমান শাসক শ্রেণী সহজেই বুঝে গিয়েছিলেন। তাই গ্যালিলিওর উপর শাস্তি নেমে এসেছিলো, ব্রুনোকে পুড়ে মরতে হয়েছিলো।

ডারউইনের তত্ত্বকেও এই রকম কারণে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিলো। সৌভাগ্যক্রমে ইংলণ্ড তখন সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উন্নীত হয়ে গিয়েছিলো। ডারউইন তাঁর তত্ত্বের সামাজিক বার্তার কথা উপলব্ধি করে শিউরে উঠেছিলেন ; মার্কস, এঙ্গেলস উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন।

একই রকম কারণে প্রাচীন ভারতে চার্বাকপন্থীদের, লোকায়ত দার্শনিকদের, শাসকশ্রেণী বিশেষ ভয় করতো।[৯] তাদের ঘৃণা করত, নিগৃহীত করত। বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁদের কিছু ধারণা আছে, তাঁরাও হয়তো আশ্চর্য হয়ে যাবেন লোকায়ত দর্শনের বক্তব্যের সাথে পরিচিত হ'য়ে—

"লোকায়তই একমাত্র শাস্ত্র। এই মতবাদে প্রত্যক্ষ প্রমাণই একমাত্র প্রমাণ। ভূত সংখ্যায় চারিটি—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু।..... ভূত সমূহই চেতনা প্রাপ্ত হয়। পরলোক নাই, মৃত্যুই হইল অপবর্গ (পরিণাম)।" [গৌরীনাথ শাস্ত্রী—সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ১৩৭৬]

অন্ধ বিশ্বাস বনাম মুক্ত মন [৬]

শুনতে অদ্ভুত মনে হলেও এটা সত্য যে মন একেবারে 'মুক্ত' হলে কিন্তু তা বিজ্ঞানের সহায়ক হতে পারে না। একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, যেহেতু তিনি 'বিজ্ঞানী' অতএব বিবর্তনবাদ ইত্যাদি তত্ত্বের পঠন পাঠন করলেও দানিবেনের তত্ত্ব তিনি উড়িয়ে দিতে পারেন না। এটি বিজ্ঞান বিরোধী মনোভাব নয় কি ? পূর্বসূরীদের অর্জিত বিদ্যাকে ভিত্তি করে সেই পথরেখা ধরে অগ্রসর না হলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব হয় না। তাই কোনো আবিষ্কারের পিছনে থাকে দীর্ঘ ইতিহাস। প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির প্রতি অগাধ বিশ্বাস রেখে অগ্রসর হ'লেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হয়।

"Something must tell the scientist where to look for and what to look for.... Strongly held convictions that are prior to research often seem to be a precondition for success in the sciences. Aristotle's Physica, Ptolemy's Almagest, Newton's Principia and Opticks, Franklin's Electricity, Lavoisier's Chemistry, Lyell's Geology, these works and many others all served for a time implicitly to define the legitimate problems and methods of a research field for succeeding generations of practitioners."

সমকালীন মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীরা স্বভাবতই রক্ষণশীল, প্রচলিত তত্ত্বাবলী (paradigm)-তে বিশ্বাসী। সেদিনের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। পরমাণু বিভাজন আজ সর্বজনস্বীকৃত হোলেও ১৯৩৯ এর আগে তা ছিল না। ফিশনের আবিষ্কর্তা অধ্যাপক অটো হান ডালটনের পরমাণুবাদের (১৮০৩) দর্শনে গভীর ভাবে বিশ্বাস ক'রে ভাবতেন যে নিউক্লিয়াস ভাঙা সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর গবেষণাগারের পরীক্ষালব্ধ ফলাফলে দেখা যায় যে নিউক্লিয়াস ভাঙছে। এই কথা প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী হিসাবে বলতে তিনি একেবারেই সাহস পাচ্ছিলেন না। ইতিহাসে দেখা যায় যে মাঝে মাঝে পরীক্ষালব্ধ তথ্য বা বাস্তব ঘটনা বাধ্য করছে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে চরম সত্য ব'লে স্বীকার না করতে। ট্র্যাডিশন ভেঙে এমনি ক'রেই চলে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা।

এক কথায়, বিজ্ঞানের অগ্রগতি বিজ্ঞানীর কাছে দাবী করে একদিকে বিজ্ঞানের পদ্ধতি, বিজ্ঞানের দর্শন, কার্যকারণবাদ, পূর্বপ্রমাণিত তত্ত্বের ওপর গভীর আস্থা, আবার অন্যদিকে বাস্তব ঘটনাবলীকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনও নতুন ধারণা গ্রহণ করার মতো সাহস। বিজ্ঞানে 'মুক্তমন' বলতে ঐতিহাসিকভাবে বিবর্তিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-গুলোকে বর্জন করা বোঝায় না, বরং সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে ক্রমাগত সেগুলোকে সমৃদ্ধতর ক'রে চলার মানসিকতাই বোঝায়। স্বভাবতঃই কোথায় যে বৈজ্ঞানিক দর্শনের সমাপ্তি ঘ'টে গোঁড়ামি শুরু হয়, আর কোথায় যে 'মুক্তমন' শেষ হয়ে জ্ঞানের জগতে নৈরাজ্যবাদ শুরু হয় এটা পুরোপুরি কোনও ফর্মুলা দিয়ে বলা যায় না। নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক অভিজ্ঞতাই এটা বিচারের একমাত্র মাপকাঠি।

বিজ্ঞানের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা [১৫,৬]

বিজ্ঞানের একটি "অতি আশ্চর্য আন্তর্জাতিক সার্বজনীন রূপ আছে।... বিজ্ঞান শুরু হইতেই সার্বজনীন, সমগ্র মানবের সাধারণ সম্পদ" (সমরেন্দ্র নাথ সেন)। কথাটি বিরাট প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে হয়তো সত্য; কিন্তু কোনো বিশেষ দেশে কোনো বিশেষ কালের স্বল্প পরিসরে হয়তো পুরোপুরি সত্য নয়। বিজ্ঞান (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা) যদি আন্ত-র্জাতিকই হবে, তবে উৎপাদনের কারিগরী কৌশল এখনও পাশ্চাত্য দেশগুলির করায়ত্ব থাকে কেমন করে, কেন তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এখনও পশ্চাৎপদতা, দারিদ্র্য, কুসংস্কারের ঘন-তমসা? বিজ্ঞানের একটি জাতীয় রূপও আছে, তারও একটি শ্রেণী চরিত্র আছে। বিজ্ঞান এ বিচারে সার্বজনীন নয়। বিপুল প্রাকৃতিক ও জন-সম্পদ-সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও শতাব্দীর পর শতাব্দী, এমন কি আজো বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদেও, ভারতবর্ষ বিজ্ঞানে পশ্চাৎপদ। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি ও সমাজবাদী দেশগুলির সাথে আমাদের জ্ঞান ও উন্নতির পার্থক্য বাড়ছেই।

উপসংহার

বিজ্ঞানের ইতিহাসের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। পদ্ধতি ও ধারাও তার স্বতন্ত্র। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক আর কয়েকজন ঐতিহাসিক এক জায়গায় হ'লেই বিজ্ঞানের ইতিহাস লেখা হ'তে পারে না। এর জন্য ইতিহাস এবং অর্থনীতির ধারণা থাকা যেমন প্রয়োজন, তেমনি দর্শন ও সমাজবিদ্যাও কিছু জানতে হবে। এ ছাড়া বিজ্ঞানের সব বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা থাকতেই হবে। তাই এর মধ্য দিয়ে এক পূর্ণতর শিক্ষার সম্ভাবনা থেকে যায়। বিজ্ঞানকে যদি জনপ্রিয় করতে হয় তবে তা মাতৃভাষার মাধ্যমেই ক'রতে হবে; গ্যালিলিও, ডেকার্টে প্রমুখেরা তাই ল্যাটিনের পরিবর্তে কথ্য ভাষাতেই বিজ্ঞান চর্চা করতেন। অতীতে একদিন ছিল যখন অনেকেই সর্বজ্ঞানী (universal scholar) ছিলেন। কিন্তু আজ? ওপেনহাইমারের ভাষায় (১৯৫৮)..... "গণিতজ্ঞরাও গণিত জানেন না। প্রত্যেকে তাঁর বিষয়ের শাখা সম্বন্ধে কিছু জানেন এবং সংসম্ভ্রম ও ভ্রাতৃপ্রতিম মনোভাব নিয়ে একে অপরের কথা শোনেন।...আমরা যা ভাবি তাকে এমনই পরিমার্জিত করি, শব্দ-গুলির অর্থাবলী এমনই আমরা পাল্টে ফেলেছি, এমনই এক ট্র্যাডিশন আমরা গড়ে তুলেছি যে, বিজ্ঞানচর্চা আজ সাধারণভাবে সংস্কৃতিকে আর ঐশ্বর্যশালী করে না...এগুলি এখন আর সাধারণ মানবমননের অংশ নয়।" ফলে বিজ্ঞানকে যতটা সম্ভব সামগ্রিকভাবে তুলে ধরার প্রয়োজনও বাড়ছে। বিজ্ঞানের ইতিহাস একাজে সহায়তা করবে।

বিজ্ঞানের বিচিত্র ইতিহাস নিয়ে দিল্লী, পাঞ্জাব প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ক'লকাতাতেও) পঠন পাঠন এবং গবেষণা শুরু হ'চ্ছে। ইউনেস্কো শুরু থেকেই এই ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন। ভারতীয় সায়েন্স একাডেমি এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনও এ ব্যাপারে আগ্রহী। বিদগ্ধ মহলে এর ব্যাপক অনুশীলন হোক এবং ক্রমে তা ব্যাপক জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হোক। সাধারণ মানুষের সাথে বিজ্ঞানের যোগসূত্র স্থাপনকে তা ত্বরান্বিত ক'রবে।

মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

গ্রন্থ পঞ্জী

1. বিজ্ঞানের ইতিহাস : সমরেন্দ্রনাথ সেন (১৯৬২)
2. Science and Society : Bertrand Russel (1952)
3. Science Through the Ages : Justus Schiffers in the Book of Popular Science (Grolier 1970).
4. Dialectics of Nature : F. Engels
5. Science in History : J. D. Bernal (1965) (Penguin).

6. The Sociology of Sciences (Ed.) Barry Bernes (Penguin 1972).
7. A Concise History of Science in India : Ed. D. M. Bose, S. N. Sen and B. V. Subbarayappa (1971).
8. Mathematics and Science in China and the West : Joseph Needham (Science and Society Vol, 20, 1956)
9. Materialism : M. N. Roy.
10. The Technology and Economy of Mughal India : Irfan Habib (Debraj Chanana lectures, 1970).

The Scaffold Called 'National Science'

[বিজ্ঞানী বিনোদ শাহের আত্মোৎসর্গ প্রসঙ্গে 'সেল্ফ্ ইমোলেশন অব এ সায়েন্টিস্ট' বইটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই বইয়ে প্রামাণ্য তথ্য সহযোগে বিনোদ শাহর আত্মবলিদানের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। দেখানো হয়েছে বিজ্ঞানের কর্তাব্যক্তিদের কি ধরণের দুর্নীতির প্রতিবাদে বিনোদ শাহ বেছে নিয়েছিলেন এ পথ। চিত্রিত হয়েছে বিনোদ শাহের ব্যক্তিত্ব আর মানসিকতা। এই প্রবন্ধে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চের ডিরেক্টর এম. এস. স্বামিনাথনের কার্যকলাপ আলোচিত হয়েছে। বিনোদ শাহ প্রধানতঃ এঁরই ভুয়ো গবেষণার প্রতিবাদ ক'রতে চেয়েছিলেন, যদিও তাঁর লক্ষ্য ছিল পুরো ভারতীয় বিজ্ঞানকেই অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসা।]

The publication of the book 'Self-immolation of a Scientist*, has provided a solemn occasion for all of us to recall and ponder over the circumstances, prevailing in our country, leading from time to time to the tragic loss of national assets like Dr. Vinod H. Shah. A promising young scientist and a patriot in his lifetime, Dr. Shah was a maize agronomist in the Indian Agricultural Research Institution (IARI), Delhi. It was a great loss to the country when, on 5th May, 1972, he committed suicide by hanging himself.

The book provides an insight into the causes which led to this drastic step and is an indictment of the manner in which agricultural research is administered in our country. Newspaper reports, letters, articles, enquiry reports are collected together. The book is mostly in English, but some pages are in Gujrati and a few in Hindi. Those interested and involved in the movement of scientific workers in the context of Indian society will definitely find the book a source of knowledge and strength.

In his last testament Dr. Shah makes the charges (among others) that 'lots of unscientific data are collected and passed on to fit .. the ilne of thinking of the Director (Dr. M. S. Swaminathan)' ; and that 'mediocre people' who keep 'the higher authorities close to them by fair or foul means are recruited and promoted in preference to those with initiative, dedication and ability.' Of particular interest is the material in the book concerning the first charge since its implications go beyond the immediate needs and problems of those engaged in research, and involve the norms of honesty in science and the food that people eat. Dr. M. S. Swaminathan (MSS), Director-General, Indian Council of Agricultural Research

* Edited and complied by Manu Kothari from Navajivan Press, Ahmedabad. Published by J. H. Shah, brother of Vinod Shah, on behalf of the family. The book is unpriced.

With the Best Compliments of :

SEN & PANDIT LTD.

ELECTRONICS DIVISION

25, LAKE ROAD,

CALCUTTA-700029

(ICAR), winner of $10,000 Ramon Magsaysay Award, in recognition of his spectacular claim for lysine and protein increase by radiation mutation of wheat, had, it appears, cheated. In 1963 Dr. Norman Borlaug of the International Maize and Wheat Improvement Centre in Mexico was distributing the dwarf wheat varieties which were the foundation of the 'green revolution.' Tall plants collapsed if grain heads were made bigger, but short plants did not, so that with the dwarf varieties more fertiliser and more water could be used and the yield more than doubled. In 1963, India received several dwarf wheats of which one, Sonora 64, proved suitable for late sowing But its drawback was that it was red rather than the amber which is preferred in India. In November, 1963 a team headed by Swaminathan (IARI) subjected some Sonora 64 seeds to gamma rays and ultraviolet light. In 1967 Swaminathan made a spectacular announcement. The mutant named Sharbati Sonora was amber, was claimed to be rich in protein and lysine (lysine is an amino acid that is high in animal protein but low in plant protein and thus often deficient in vegetarian diets). In October, 1937 MSS at a New Delhi symposium claimed that in protein and lysine Sharbati Sonora (SS) was comparable to milk. In November, 1967 in an article in Food Industries Journal he toned down his claim to 4·61% (not 7 to 8% as in milk), but still higher than 1·86% for Sonora 64 (S64) as far as lysine was concerned. Further, he claimed 16·5% protein for SS vs 14% for S64. These claims were hailed by various interested people. But other laboratories (Purdue and Nebraska) found that there was no significant difference in lysine content of SS and S64. In three papers in 1968 MSS climbed down to 3% lysine for SS; also the 1·86% he had reported for S64 he now quoted as 2 to 2·3%. Finally in 1969 Borlaug spoke, 'in no case was there a significant difference between the normal and the mutants in lysine and protein content.' Yet in January 1971, MSS published in the journal 'Plant Food for Human Nutrition' his tall claim (of 1967 already published in Food Industries Journal) with no indication that it had been published in another journal more than three years earlier. It was in August 1971 that MSS received the Ramon Magsaysay Award and the citation among other things said, 'MSS had developed SS with 3% lysine which was now alleviating the deficiency of essential amino acids in the Indian diet, so harmful particularly to brain development in young children'. And this was ironical since SS was already well on its way out. In January 1972 MSS became Director-General of ICAR and the whole episode may have been forgotten had it not been for the suicide of Dr. Shah. The lysine story also shows us how to beat their own drums one science department re-inforces another. After trumpeting the triumph of nuclear energy applied to plant improvement no one was willing to admit that the report was erroneous, and intersted parties extolled the virtues of radiation mutation. But though radiation mutation has had a few successes most useful results have been obtained by search for already existing genetic variation which is of course a much cheaper method. Indeed, the final irony is that SS may not be a radiation mutation at all. Apart from Sharbati Sonora, false claims have also been made by our 'great scientists' on Baisakhi Moong, new strains of Maize, some varieties of Sabarmati rice etc. The trouble is that the scientists at the top and in the administration are engaged in all sorts of self-promoting activities while the scientists working under them either sing to the tune of the bosses or are frustrated.

Incidentally, it is to be put on record that not only the so-called scientific institutions of this

country, but internationally reputed institutions overseas, also forsake from time to time the norms of objectivity in science and openly patronize the 'scientists' thriving on got-up research. Swaminathan was elected a fellow of the Royal Society in 1974. In this connection, the following extract from New Scientist (6 Feb., 1975) is relevant : " On 15 March 1974, Dr. Swamanathan was elected a fellow of the Royal Society, notwithstanding the publication in August 1969 of Dr. Borlaug's CIMMYT data showing the extensive non-validity of Dr. Swaminathan's protein and lysine data, and even after press articles on 19 Jan., 1973 put on record that the official report of the enquiry into the allegations arising from Dr. Shah's suicide in protest against professonal and administrative irregularities in science had been submitted to the authorities. That report provided evidence of continuing publication of non-valid data by Dr. Swaminathan in a manner clearly contrary to the motto of the Royal Society expressing its determination to withstand dogma and to verify all statements by an appeal to facts." (R. A. Silow, an ex-Director of FAO).

Dr. Shah has been a martyr at the scaffold called 'national-science'. There have been others. The scientific workers of the country owe a debt to them which can be redeemed only through an organised effort on their part to fight against the abuse of science. Dr. Shah took his life. But he does not belong to the category of 'suicides' of whom Hermann Hesse speaks (quoted in 'Self-Immolation of a Scientist') :

"To 'suicides' belong plenty of people who are walking dead, whose lives are stories of continuous compromises with principles and many of them crowd our several living graveyards of scientific institutions."

—B. Dutta Roy

খাদ্যে মেশানো মনোরম বিষ

খাবার জিনিসে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রায় ২০,০০০ রকমের রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। এদের অনেকগুলির দরুণ আমাদের ক্যানসার হ'তে পারে। EEC-প্রণীত খাদ্যে ব্যবহৃত সুগন্ধির অধুনাতম তালিকায় আছে ৪২৫টি স্বভাজ এবং ৬২৫টি কৃত্রিম নির্দোষ সুগন্ধি, ২৮৪টি কৃত্রিম সুগন্ধি যেগুলির অস্থায়ী ব্যবহারের ছাড়পত্র আছে, ২৪৩টি কৃত্রি। সুগন্ধি যেগুলির গুণ অজানা এবং মাত্র ৩টি সুগন্ধি যেগুলির ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ। প্রসংগতঃ, অস্থায়ী ছাড়পত্রের এবং অজানা গুণাগুণের রাসায়নিকগুলির অনেকগুলি সম্পর্কেই অনেক প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিকের সতর্কবাণী থাকা সত্ত্বেও পুঁজিপতি গোষ্ঠীর চাপেই সেগুলির ব্যবহার অব্যাহত আছে। খাদ্যে রং হিসাবে যে রাসায়নিকগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম বাধা নিষেধ আছে। কি বিচারের মাপকাঠিতে এই বাধানিষেধগুলি চালু করা হয়েছে তা বলা মুস্কিল। সবুজ S রংটি আমেরিকায় নিষিদ্ধ, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে ও ভারতে এটি নিষিদ্ধ নয়। স্বভাবতঃই সন্দেহ জাগে যে মানব শরীরের নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বেগ এইসব বাধা-নিষেধ প্রণয়নের পিছনে একমাত্র কারণ নয়। জারনের দরুণ মাখনের বিকাররোধের জন্য মাখনে যে বিউটিলেটেড হাইড্রক্সি টলুইন (BHT) ব্যবহার করা হয় তা কোষে সঞ্চিত হয়ে থাকে। এই জন্যে অনেক দেশে এর ব্যবহার আইনতঃ নিষিদ্ধ। শোধিত মাংসে লালিমা আনার জন্য নাইট্রাইট যৌগ ব্যবহার করা হয়। এই যৌগগুলি হিমোগ্লোবিন নষ্ট ক'রে মিথাইল হিমোগ্লোবিন উৎপন্ন করে। নাইট্রাইট গ্রহণের কুফল হিসাবে পশ্চিম জার্মানীতে শিশুদের ভিতর মিথাইল হিমোগ্লোবিন জনিত রক্তাল্পতা রোগের প্রকোপ আজ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

আমাদের দেশে খাদ্যে মেশানো এই সব রাসায়নিক ব্যবহারের বিপদের সমস্যাটির গুরুত্ব অনেক বেশী। আমাদের দেশের বিজ্ঞানকর্মীদের কর্তব্য হচ্ছে এই সব বিপদগুলি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা। বিজ্ঞানকর্মীরা আশু কতকগুলি দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন করার কথা বিবেচনা করে দেখতে পারেন—যেমন (১) ভারতে খাদ্যে ব্যবহৃত ক্ষতিকারক রাসায়নিকগুলিকে তালিকাবদ্ধ করা হোক (২) সমস্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকেই তাদের উৎপন্ন বা তাদের ব্যবহৃত রাসায়নিকের সংকেত প্রকাশ করতে বাধ্য করা হোক।

বিজ্ঞানকর্মী ও সাধারণ জনগণের যৌথ সচেতনতা ও আন্দোলনই খাদ্যের 'মনোরম' বিষক্রিয়ার হাত থেকে বিশেষ ক'রে আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে বাঁচাতে পারে।

বিজয় সরকার

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস কি সার্থক হয়ে উঠতে পারে না ?

মহামতি চাণক্যের বক্তব্য : যেখানে নগ্ন সাধুদের বাস সেখানে রজকের, আর যেখানে শ্রোতা নেই সেখানে বক্তার উপস্থিতি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবরের উপদেশবাণী হিসাবে কথাটা, বিশেষতঃ দ্বিতীয় অংশটা, শোনা আর আপন অভিজ্ঞতার বিনিময়ে বোঝা, দুইয়ে পার্থক্য প্রবল। উদাহরণস্বরূপ বলি, চাণক্যের শ্লোকটি প'ড়ে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কোন দিন বিমর্ষ বোধ করি নি। অথচ জানুয়ারীর এক শীতের আমেজছোঁয়া সকালে এক অধ্যাপককে নিতান্ত পাংশু বিমর্ষ মুখে জনহীন বক্তৃতাকক্ষের বাইরে পায়চারি ক'রতে দেখেছিলাম। কারণ আর কিছু নয়, বিজ্ঞান কংগ্রেসের সেদিনকার এক বিভাগীয় সভায় তিনি ছিলেন বক্তা, অথচ শ্রোতৃমণ্ডলী তথা উদ্যোক্তারা কোনও অজ্ঞাত কারণে ছিলেন বেমালুম অনুপস্থিত। স্থানকালপাত্রের বিশদ বিবরণ এখন আর মনে নেই। কিন্তু অধ্যাপকের সেদিনকার উৎকণ্ঠ আশাভঙ্গের ছবিটা মনে গাঁথা হয়ে আছে।

আর একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে। তখন আমরা ছাত্র ছিলাম। কোনও এক বছরের বিজ্ঞান কংগ্রেসের এক সাধারণ সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন বিশ্ববিখ্যাত এক রুশ বিজ্ঞানী (যতদূর মনে পড়ছে নোবেল পুরস্কারজয়ী পদার্থবিদ্ প্রোখরভ)। সভায় তিল ধারণের স্থান নেই। বক্তার কথা শুনে বোঝা গেল যে বিজ্ঞানে তিনি যতটা পারদর্শী ইংরাজি কথনে ঠিক ততটা আনাড়ি। কিন্তু তাতে তাঁর কিছুমাত্র দমার লক্ষণ নেই। হাত পায়ের বহুল ব্যবহার সহযোগে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে প্রায় এক ঘণ্টার ওপর ধরে অসাধারণ যত্নের সাথে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখলেন। রেখে সবিনয়ে জানতে চাইলেন উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের কোনও জিজ্ঞাস্য আছে কিনা। তার পরের দৃশ্যটাই দেখার মতো। সভাকক্ষ জুড়ে থমথম ক'রছে শ্মশানের নৈঃস্তব্ধ্য। বিজ্ঞানীবরের চোখে-মুখে শিশুসুলভ ব্যথিত বিস্ময়। তাঁর এত যত্ন, এত প্রচেষ্টা নিষ্ফল হ'লো ? এত লোক এসেছে শুধু তারকা হিসাবে তাঁকে দেখতে, তাঁর বক্তব্য বুঝতে নয় ? পরে অবশ্য দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হ'লো, কিন্তু বোঝাই গেল যে সেগুলো নেহাৎ চেষ্টাকৃত। সেদিনকার বিজ্ঞানকংগ্রেসের সভায় ভারতীয় বিজ্ঞানের এই ছবিটা দেখে আমার তখনকার অপেক্ষাকৃত সংবেদনশীল ছাত্রমন আর যাই হোক, গৌরব বোধ করে নি। পরে দেখেছি, শ্রোতাদের নীরবতার পেছনে কোনও 'যুক্তি' যে নেই তা নেই তা নয়। কিন্তু একই সাথে সর্বদা এটাও মনে হ'য়েছে, বিজ্ঞান বিষয়ে একটা ভাল বক্তৃতা হ'লো, অথচ শ্রোতারা ভাবলেশবিহীন হ'য়ে রইলেন, এটা কি খুব সুস্থ পরিস্থিতির লক্ষণ ?

বিজ্ঞান কংগ্রেস প্রসঙ্গে এই রকমই আরও কিছু ঘটনার উল্লেখ করা যেত। কিন্তু সে ধরণের টুকরো চিত্র তুলে ধরার বদলে বরং সামগ্রিক মূল্যায়ন হিসাবে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ওপর লেখা প্রবন্ধগুলোর মধ্যে সম্ভবতঃ সবচাইতে বেশী আলোচিত, সবচাইতে তীক্ষ্ণ সমালোচনাসমৃদ্ধ যে রচনা, তা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক : "……বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটানো, অথচ আমার মতে এই কাজেই (বিজ্ঞান কংগ্রেস) ব্যর্থ হ'য়েছে। এটাকে কার্যকর ক'রে তুলতে খুব অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এর জন্য কিছু প্রভাবশালী লোকের বিরুদ্ধে অসৌজন্যের প্রয়োজন হবে। কিন্তু বিজ্ঞানে সৌজন্যের চাইতে পারদর্শিতা বেশী গুরুত্বপূর্ণ।" ভারতীয় বিজ্ঞানের অন্যতম সুহৃদ জে. বি. এস. হালডেন প্রায় কুড়ি বছর আগে যা লিখেছিলেন আজ তা হৃদয়ঙ্গম করার গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেক বেশী। বেশী এই কারণে, যে কুড়িটা বছর কেটে যাওয়ার পরও বিজ্ঞান কংগ্রেস ভারতীয় বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এক ধাপও অগ্রসর হয় নি। বিজ্ঞান কংগ্রেস এখনও কিছু প্রভাবশালী লোকের বা গোষ্ঠীর বিজ্ঞানের সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্করহিত কিছু উদ্দেশ্যসাধনের রঙ্গমঞ্চ হ'য়ে র'য়েছে। আর বিজ্ঞানকর্মীরা বিজ্ঞানকংগ্রেসের মঞ্চকে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক আদান-প্রদানের কাজে ব্যবহার করার জন্য ঐসব প্রভাবশালী লোকেদের বিরুদ্ধে 'অসৌজন্য' প্রদর্শন ত দূরের কথা, সবরকম প্রচেষ্টা বিসর্জন দিয়ে একটা অদ্ভুত সমালোচনাতিক্ত নিষ্ক্রিয়তার খোলসে আশ্রয় নিয়েছেন। বিজ্ঞান-কর্মীদের একটা অংশ বিজ্ঞানকংগ্রেসের সাথে কোনরকম সম্পর্ক রাখতেই নারাজ—বিজ্ঞানকংগ্রেস কায়েমী স্বার্থের সংগঠন, বিজ্ঞান কংগ্রেসের কোন ভবিষ্যৎ নেই, এটা দেশের সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্করহিত, এতে সত্যিকারের বিজ্ঞানের কোন স্থান নেই, এইসব নানা অভিযোগ তাঁদের। এর মধ্যে অনেকগুলি অভিযোগই সত্যি ; এত সত্যি, যে তা নিয়ে কোন বিতর্ক চলে না। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, তাঁরা এইসব অভিযোগের ভারে এতই পীড়িত যে তাঁদের একটা বড় অংশের ক্ষেত্রেই এর বিপরীত কোন সাংগঠনিক প্রচেষ্টার উপস্থিতি নেই। এই ধরণের প্রচেষ্টার

অনুপস্থিতিতে কায়েমী স্বার্থ যে কায়েম হ'য়ে রইবে তাতে আশ্চর্যজনক কিছু আছে কি? অপ্রিয় হ'লেও ব'লতে হ'চ্ছে, এঁদের অনেকেরই চিন্তার গতি অনেকটা এইরকম: কায়েমী স্বার্থের প্রভাবমুক্ত এমন একটা সংগঠন যদি থাকতো যাতে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনগুলো সামনে আসতে পারছে, যেখানে সত্যিকারের বিজ্ঞানের চর্চা হচ্ছে, তবে তাতে তাঁরা সাগ্রহে অংশগ্রহণ করতেন। দুঃখের কথা, এই ধরনের স্বপ্নচারিতার শিকার যাঁরা তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে সবচেয়ে সৎ, নিষ্ঠাবান কর্মীরা, যাঁদের হতাশ্বাস মানসিকতার অবসান ঘটলে ভারতীয় বিজ্ঞান এগিয়ে চলবে জোর কদমে। বিজ্ঞানকর্মীদের অন্য অংশটার আচরণ কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। এঁরা বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনগুলোতে যান, একটা আধটা করে 'পেপার'ও পেশ করে থাকেন, আর কোনও বছরের অধিবেশন যদি দ্রষ্টব্য কোন জায়গায় না হয় তবে বিমর্ষ বোধ করেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসকে বৈজ্ঞানিক মতামত আদান-প্রদানের মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করার বা স্ব স্ব বিষয়ে নতুন নতুন কাজ কোথায় কি হচ্ছে তা জানতে চেষ্টা করার দিকে এঁদের বিশেষ যত্ন আমার অন্তত চোখে পড়ে নি। অর্থাৎ বিজ্ঞান কংগ্রেসে এঁদের নিয়মিত অংশগ্রহণের পিছনে আর যাই কারণ থাক বিজ্ঞান গবেষণার ভূমিকা সেখানে নিতান্ত গৌণ।

বিজ্ঞানকর্মীদের এই দুই অংশ ছাড়া তৃতীয় আর যে অংশটা বিজ্ঞান-গবেষণার স্বার্থেই বিজ্ঞান কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করে থাকেন তাঁদের সংখ্যা আমার অভিজ্ঞতা অনুসারে খুবই অল্প। দুঃখের বিষয় এঁরা দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতি ঘটানোর কাজে বিজ্ঞান কংগ্রেসের ব্যর্থতায় পরিতাপ বোধ করেন কিন্তু এই ব্যর্থতা রোধে কোনও উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা তাঁদের তরফ থেকে এখনও গড়ে ওঠে নি। গড়ে না ওঠার পেছনে হয়তো যথেষ্ট কারণ রয়েছে; কিন্তু কারণ যাই থাক, তার নীট ফলাফল হলো, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসকে হালডেন যে অবস্থায় দেখে গিয়েছিলেন, আজও তা সেই অবস্থাতেই রয়েছে।

এখানে বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে আমি বিজ্ঞানের সেইসব ওপরওয়ালা বা 'বস্'—এদের কথা ধরিনি যাঁরা আজ ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রটাকে কয়েকটা জমিদারীতে ভাগ করে নিয়ে বিজ্ঞানজমিদার হিসাবে রাজত্ব চালাচ্ছেন। এঁদেরকে বিজ্ঞানকর্মী হিসাবে চিহ্নিত করার মতো কোন সঙ্গত কারণ আমার চোখে প'ড়ছে না। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে এই ধরনের বিজ্ঞানজমিদারদের সংখ্যা ও ভূমিকা এখানকার তুলনায় অনেক কম। সেখানেও বিজ্ঞান অনেকটা পরিমাণেই কায়েমী স্বার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানেও অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী চূড়ান্ত মানবতাবিরোধী কাজে অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু সেখানে বিজ্ঞানচর্চা আমাদের দেশের তুলনায় অন্ততঃ এতটা এগোতে পেরেছে যে, যে লোকটার সাথে বিজ্ঞান-গবেষণার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, সে আর যাই হোক বিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃতি বা সম্মান পায় না। পেলেও তাদের সংখ্যা অনেক কম। হ্যালডেন এটা স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে ভারতীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রথম ধাপটা নেওয়া হবে তখনই যখন বিজ্ঞানকর্মীরা তাঁদের নিজেদের ওপর আস্থা রেখে এই বিজ্ঞানজমিদারদের সরিয়ে দিতে পারবেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস স্পষ্টতঃই একটা বিষচক্রের খপ্পরে পড়ে রয়েছে। বিজ্ঞান গবেষণার অগ্রগতিতে এর ব্যর্থতার দরুন বিজ্ঞানকর্মীরা এর পিছনে তাঁদের উৎসাহ আর মেধা নিয়োজিত করতে চাইছেন না। আবার বিজ্ঞানকর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ না থাকায় এটা বছরের পর বছর অকেজো থাকছে, কায়েমী স্বার্থ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে, কিছু লোকের স্বার্থে জাঁকজমক সর্বস্ব 'শো-পিস' হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কোনও বিষচক্রই নিজে থেকে ভাঙে না। চেষ্টা করে তা ভাঙতে হয়। এক্ষেত্রেও দেশের বিজ্ঞানকর্মীদের সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে, 'কিছুই হবে না' মনোভাব ত্যাগ করে, নিজেদের ওপর আস্থা রেখে, ভারতীয়দের চেষ্টাতেই ভারতীয় বিজ্ঞান উন্নত হতে পারে এই বিশ্বাস নিয়ে, দেশের বিজ্ঞান গবেষণার প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে হবে। আমার বিশ্বাস যে গোড়াতেই এর জন্য প্রচুর হৈ চৈ, আন্দোলন, সংঘাতের প্রয়োজন নেই। গোড়ায় যা প্রয়োজন তা হলো বিজ্ঞানকর্মীদের মনোভাবে উদ্দেশ্যমূলকতা নিয়ে আসা ও এই উদ্দেশ্য-মূলকতার ভিত্তিতে সংগঠিতভাবে দেশবাসীর স্বার্থকে সম্মুখে রেখে সক্রিয় অংশগ্রহণ। তার পরের ধাপে হয়তো আসবে সংঘাত; কিন্তু তার বিনিময়ে সমৃদ্ধ হবে বিজ্ঞান।

এ লেখা যখন প্রকাশিত হবে তখন ভারতের অন্যতম শিল্পকেন্দ্র আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে বিজ্ঞান কংগ্রেসের আর একটা অধি-বেশন। সাত দিন ধরে অনেক বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত ক'রে ফেটে যাবে আর একটা বুদ্বুদ। কিন্তু এটাও কি আশা করা যায় না যে তারই সাথে এক বছর এগিয়ে আসবে পুরনো বিজ্ঞান কংগ্রেসের খোলস থেকে এক নতুন বিজ্ঞান কংগ্রেসের আবির্ভাবের সময়?

অভিজিৎ লাহিড়ী

সায়েন্স, টেকনোলজি এ্যাণ্ড ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট

এ রহমান, ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, দিল্লী, ১৯৭৪

শ্রীযুত রহমান ভারতের বিজ্ঞানচর্চার বিভিন্ন দিক নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চিন্তা-ভাবনা করে আসছেন। এদেশে বিজ্ঞান-চর্চার ব্যাপারে তিনি বেশ কিছু সমীক্ষা আর অনুসন্ধানে অংশ গ্রহণ করেছেন। বেশ কিছু লেখা লিখেছেন ভারতীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে উৎসাহী পাঠকের জন্য। আলোচ্য বইতে বিভিন্ন সময় লেখা তাঁর কিছু গবেষণামূলক প্রবন্ধ একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সবগুলো প্রবন্ধেরই মূল বিষয় হলো দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান ও কারিগরীর উন্নয়ন-সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা। সমস্যাগুলোকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখে বেশ সহজবোধ্যভাবে এক একটা প্রবন্ধের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। সূচনায় পাঠককে পরিচিত করানো হয়েছে এদেশে বিজ্ঞানচর্চার সাংগঠনিক কাঠামোর সাথে—বলা হয়েছে বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠানের কথা, বিভিন্ন ধরণের প্রশাসনিক বিভাগের কথা, রাষ্ট্রীয় স্তরে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটির কথা। এরপর 'বিজ্ঞাননীতির সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম অংশে লেখক তুলে ধরেছেন বিজ্ঞানবিষয়ক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কর্মরত বিজ্ঞানীদের বাদ দিয়ে একটা বদ্ধ আবহাওয়া (লেখকের ভাষায় 'ক্লোজড্ বুক') সৃষ্টির প্রবণতাকে। দ্বিতীয় অংশে এরই বিশদতর আলোচনা হিসাবে দৃষ্টান্ত সহযোগে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে একদল বিজ্ঞানী আমলা নিয়ে গড়ে উঠছে একের পর এক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কমিটি আর কিভাবে ভারতীয় বিজ্ঞানে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক কর্মীদের তুলনায় এই বিজ্ঞানী আমলা বা 'কমিটিম্যান' এর প্রাধান্য বেড়ে চলেছে। এই প্রবন্ধেরই তৃতীয় অংশের আলোচ্য বিষয়—ভারতের মাটিতে ভারতীয় বিজ্ঞানের শিকড় মজবুত করার সমস্যা।

এর পরের প্রবন্ধে রয়েছে ভারতীয় বিজ্ঞানকর্মীদের ওপর আলোচনা—তাঁরা কি ধরণের কাজ করেন, তাঁদের মধ্যে কি ধরণের শ্রেণীবিভাগ র'য়েছে, কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য সুবিধা আসে কি ধরণের সূত্র থেকে, তাঁদের মানসিকতা কোন কোন ধরণের উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—এ সবই যতটা সম্ভব তথ্যসহযোগে আলোচিত হয়েছে। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের নিয়ে এধরণের তথ্যভিত্তিক আলোচনা এর আগে খুব কমই হয়েছে। সেদিক দিয়ে লেখক নিশ্চয় দাবী করতে পারেন নতুন আলোকপাতের কৃতিত্ব। তবে এধরণের আলোচনা আর প্রায় নেই বলেই হয়তো বিশ্লেষণ খুব গভীরে যেতে পারেনি। লেখকের এ কাজ অন্য বিজ্ঞানীরা হাতে তুলে নেবেন এটা নিশ্চয় আশা করা যেতে পারে।

পরের প্রবন্ধে বিজ্ঞান ও কারিগরী সংক্রান্ত গবেষণায় বিনিয়োগের বিভিন্ন সূত্র ও কোন সূত্র থেকে কতটা বিনিয়োগ হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা রয়েছে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যাও আলোকিত হয়েছে। গবেষণার ব্যাপারে শিল্পী সংস্থাগুলোর ঔদাসীন্য তথ্যসংযোগে দেখানো হয়েছে। এই প্রবন্ধে প্রচুর প্রয়োজনীয় তথ্যের সমাবেশ রয়েছে, যদিও এগুলোর বিশ্লেষণ পুরোপুরি আশানুরূপ হয়নি। এই প্রবন্ধের সংযোজিকায় বিজ্ঞাননীতি বিষয়ে কিছু সরকারী দলিল (১৯৫৮ সালের সরকারী প্রস্তাবের অংশ) ও তথ্যাদি রয়েছে।

এর পর সায়েন্স, টেকনলজি অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল গ্রোথ শীর্ষক প্রবন্ধে শিল্প বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান ও কারিগরীর কিছু সমস্যার আলোচনা আছে। এই প্রবন্ধেও লেখক অনেক দিক থেকে অনেক ধরণের তথ্য উপস্থিত করলেও আলোচনা কিছুটা পরিমাণ বিক্ষিপ্ত ও অসংবদ্ধ রয়ে গিয়েছে। শেষের দুটি প্রবন্ধে লেখক ভারতে ঔষধ শিল্প আর ইস্পাত শিল্পে বিজ্ঞান ও কারিগরী ভিত্তিক গবেষণার বিষয়ে কিছু সমীক্ষার ও অনুসন্ধানের ফলাফল তুলে ধরেছেন। এই প্রবন্ধ দুটো বিশেষতঃ এর প্রথমটা, পাঠকে বেশ কিছু চিন্তার খোরাক যোগাবে।

দুঃখের বিষয়, বইটা ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হলেও এতে ব্যবহৃত তথ্য সবই প্রায় ষাটের দশকের প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত সময়কার। রহমান আর তাঁর সহকর্মীরা কি এর পর আর তাঁদের সমীক্ষা আর অনুসন্ধান চালাননি? শ্রীযুত রহমান তাঁর আগেকার কাজের স্বীকৃতি পেয়েছেন, পাওয়া হয়তো বা উচিৎও ছিল, কিন্তু দেশবাসী কি তাঁর কাছ থেকে আশা করতে পারে না আরও কাজ, আরও বিশ্লেষণ, নতুন পরিস্থিতির নতুন মূল্যায়ন?

সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার আন্দোলন

গত ১৩ই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স কলেজে ফলিত রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক সুপ্রভাত মুখার্জির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। বিড়লা কলেজ অফ সায়েন্স এণ্ড এডুকেশন কলেজের কর্তৃপক্ষ একতরফাভাবে যে 'তদন্ত কমিটি' বসিয়ে তার রিপোর্টের ভিত্তিতে দুজন বিজ্ঞানের অধ্যাপককে ছাঁটাই ক'রেছেন সেই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন অধ্যাপক মুখার্জি। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন, উক্ত কলেজের গভর্নিং বডি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী সম্পূর্ণ বেআইনী। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে যখন ঐ কলেজের প্রশাসনিক পুনর্গঠনের কথা বিবেচিত হ'চ্ছিল তখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ অমান্য করে কলেজ কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত কমিটি বসিয়ে ঐ দুই অধ্যাপকের ওপর 'প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা' হিসাবে তাঁদের ছাঁটাই করে। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা মনে করে যে তথাকথিত তদন্ত কমিটি'র রিপোর্ট অন্যায় ও অযৌক্তিক। এই কমিটিতে অংশগ্রহণ করে অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে বিড়লা কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করার জন্য অধ্যাপক সুপ্রভাত মুখার্জির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সদস্যরা ছাড়াও বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মীবৃন্দ এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন ও সমর্থন জানান। বিক্ষোভকারীদের দাবী অনুসারে অধ্যাপক মুখার্জি এক লিখিত বক্তব্যে তদন্ত কমিটিতে তাঁর অংশগ্রহণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। ঐ বক্তব্যে তিনি স্বীকার করেন যে তদন্তে দুজন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রসঙ্গে তাঁর কাছে কলেজের অধ্যক্ষ আর অধ্যাপকবৃন্দ যথাক্রমে যে দুটো পৃথক ভাষ্য পেশ করেন তার মধ্যে তিনি কেবল অধ্যক্ষের ভাষ্যের উপরই বিশ্বাস ক'রে দুই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে রায় দেন। অধ্যাপকদ্বয়কে ছাঁটাই করার জন্য তিনি বিড়লা কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

বিজ্ঞান গবেষণায় চরম দুর্নীতি ঃ

পশু গবেষণা সংস্থার কাহিনী

সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ, ইজ্জতনগরে ভারতীয় পশুচিকিৎসা গবেষণা সংস্থার ডিরেক্টর সি. এম. সিং-এর ভুয়ো গবেষণার (?) ভুয়ো ফলাফলকে (?) সমর্থন না করার 'অপরাধে' ঐ সংস্থার একাধিক বিজ্ঞানকর্মীকে কর্তৃপক্ষের হাতে চূড়ান্ত নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছে ও হচ্ছে। ভারতীয় মহিষদের প্রায় ২০% ক্যানসার রোগে আক্রান্ত—ডিরেক্টর সি. এম. সিং নাকি তাঁর গবেষণা থেকে এ কথা দাবী করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ওই বিশেষ গবেষণা প্রতিষ্ঠানেরই বিখ্যাত প্যাথলজিষ্ট অধ্যাপক পি. কে. রায়চন্দ্র আয়ার ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে নাকি প্রতিষ্ঠিত হয় যে ডঃ সিং এর উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভুল। ফলে সেই গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা ডঃ সিং ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ক্রোধের বলি হয়েছেন ও হচ্ছেন। (সূত্র : যুগান্তর, ২৮।১১।৭৭)

এই সংবাদ মনে করিয়ে দিচ্ছে কয়েক বছর আগে ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার সেই ঘটনাগুলোকে যার করুণ পরিণতি হিসাবে জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছিল ডঃ বিনোদ শাহকে। 'বিশ্ববিখ্যাত' বিজ্ঞানী এম. এস. স্বামিনাথনের ভুয়ো গবেষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সেবারও একই রকম নিগ্রহ ভোগ ক'রতে হ'য়েছিল বিনোদ শাহ আর তাঁর সহকর্মীদের।

প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন, ভারতীয় পশুচিকিৎসা গবেষণা সংস্থা ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চের (ICAR) অধীন, যার ডিরেক্টর হলেন স্বয়ং স্বামিনাথন। সি. এম. সিং এই স্বামিনাথনেরই অনুগ্রহধন্য 'গবেষক'। ICAR ই যুগিয়েছিল ঐ 'গবেষণার' টাকা। আট বছরের মধ্যে একবারও এই গবেষণা প্রকল্পের মূল্যায়ন হয় নি। যে বিজ্ঞানীরা এই প্রকল্পের সমালোচনা করেছিলেন তাঁরা তাঁদের বক্তব্য রাখার জন্য স্বামিনাথনের সাথে একবার দেখা করার পর্যন্ত অনুমতি পান নি।

এই হলো ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণার চিত্র।

যোগাযোগের ঠিকানা :

অফিস, পঃবঃ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা

৬, প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন,

কলিকাতা

(মেডিকেল কলেজের সামনে)

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে অভিজিৎ লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সম্পাদক হিরন্ময় সাহা কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রাকর প্রেস, ১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।